Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা যাহরা

রোলঃ 227020209

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুষঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা যাহরা

রোলঃ 227020209

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতিমা যাহরা, আইডিঃ 227020209 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fatima

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফাতিমা যাহরা

আইডিঃ 227020209

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা .... Error! Bookmark not defined.

অমুসলিম দেশে মুসলিম জনসংখ্যা .... Error! Bookmark not defined.

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের অবস্থা .... Error! Bookmark not defined.

বাংলাদেশে মুসলিমদের অবস্থা .... Error! Bookmark not defined.

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকারভেদ .... Error! Bookmark not defined.

অমুসলিম দেশে বসবাসের কারণ .... Error! Bookmark not defined.

অমুসলিম দেশে বসবাসের বিধান .... Error! Bookmark not defined.

অমুসলিম দেশে দৈনন্দিন জীবনযাপন .... Error! Bookmark not defined.

অমুসলিমদের সাথে আচরণ .... Error! Bookmark not defined.

উপসংহার .... Error! Bookmark not defined.

গ্রন্থপঞ্জি .... Error! Bookmark not defined.

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে প্রায় প্রতিটি দেশের মুসলিম নাগরিক জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থেকে যাচ্ছেন। এরকম দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় দেড় কোটি মানুষ রয়েছেন বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশিদের একটি বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে কাজের উদ্দেশ্যে গেলেও, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি অমুসলিম দেশগুলোতে যাওয়া মানুষের সংখ্যাও কম নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা এবং উন্নত জীবনযাত্রার জন্য বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্ম অমুসলিম দেশগুলোতেই থেকে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে খুব কম সংখ্যক মানুষ দেশে ফিরে আসেন।

মুসলিম সমাজের একটি বৃহৎ অংশ অমুসলিম দেশে যাচ্ছেন, থাকছেন এবং স্থায়ী নাগরিকে পরিণত হচ্ছেন। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় মুসলিমরা সেসব দেশে খুব সুখে জীবনযাপন করছেন, কিন্তু বাস্তবচিত্রটি ভিন্ন। তাদের নিজেদের ধর্মপালনে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। নিজেদের ঈমান রক্ষা ও দ্বীন অনুসরণ তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও যুগোপযোগী জীবনব্যবস্থা, তাই মুসলিমদের অমুসলিম দেশে যাওয়া, থাকা, নাগরিকত্ব গ্রহণ করা, নিজ ধর্মপালন, অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা, তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ, প্রভৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের বিধান। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বিভিন্ন আয়াত বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এসব বিধান সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো মেনে চলা।

তবে ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এই বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই নগণ্য, আর বাংলা ভাষায় তো নেই বলা চলে। অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান নিয়ে আলেমদের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন মতপার্থক্য। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের ফাতওয়া ও দলিল রয়েছে, যেগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য হয়না। সুতরাং, অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের বিধান নিয়ে বাংলাদেশের আলেম সমাজের পর্যাপ্ত গবেষণা ও বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা, এবং সেগুলোকে তরুণ সমাজের বোধগম্য করে তাদের হাতে তুলে দেয়া এখন সময়ের দাবি।

অমুসলিম দেশে মুসলিম জনসংখ্যা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে আছেন মুসলিমরা। এশিয়া মহাদেশে বেশ কয়েকটি দেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করেন। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব প্রভৃতি। ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোতেও মুসলিমের সংখ্যা কম নয়।

২০০৯-এ পরিচালিত এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মুসলিম। বর্তমানে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩% মুসলিম। মুসলিমদের মধ্যে প্রায় ২০% এশিয়ায় বসবাস করে এবং এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে আবার প্রায় অর্ধেক বাস করে দক্ষিণ এশিয়ায়।। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ২০ কোটি ৩০ লাখ মুসলিম বাস করে, যা বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ১৩%। পাকিস্তানে ১৭ কোটি ৪০ লাখ, ভারতে ১৭ কোটি ৭২ লাখ, বাংলাদেশে ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১। এবং ইরান ও তুরস্কে ৭ কোটি ৪০ লাখ মুসলিম বসবাস করে। এই ছয় দেশে বিশ্বের মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ৫৩% বাস করে।

মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকায় ৩১ কোটি ৫০ লাখ মুসলিম বসবাস করে। নিম্ন-সাহারা এলাকায় প্রায় ২৪ কোটি মুসলিমের বসবাস, যা মোট মুসলমান জনসসংখ্যার প্রায় ১৫%। তাছাড়া প্রায় ৩০ কোটি মুসলমান বাস করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা বিশ্বে তৃতীয়, যা ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পরে। চীনে জনসংখ্যার প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ মুসলমান যা সিরিয়ার থেকে বেশি অন্যদিকে রাশিয়ার মুসলমান জনসংখ্যা ১ কোটি ৬০ লাখ যা জর্ডান ও লিবিয়া দুই দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর চেয়েও বেশি। ইউরোপে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখ মুসলমান বসবাস করে।

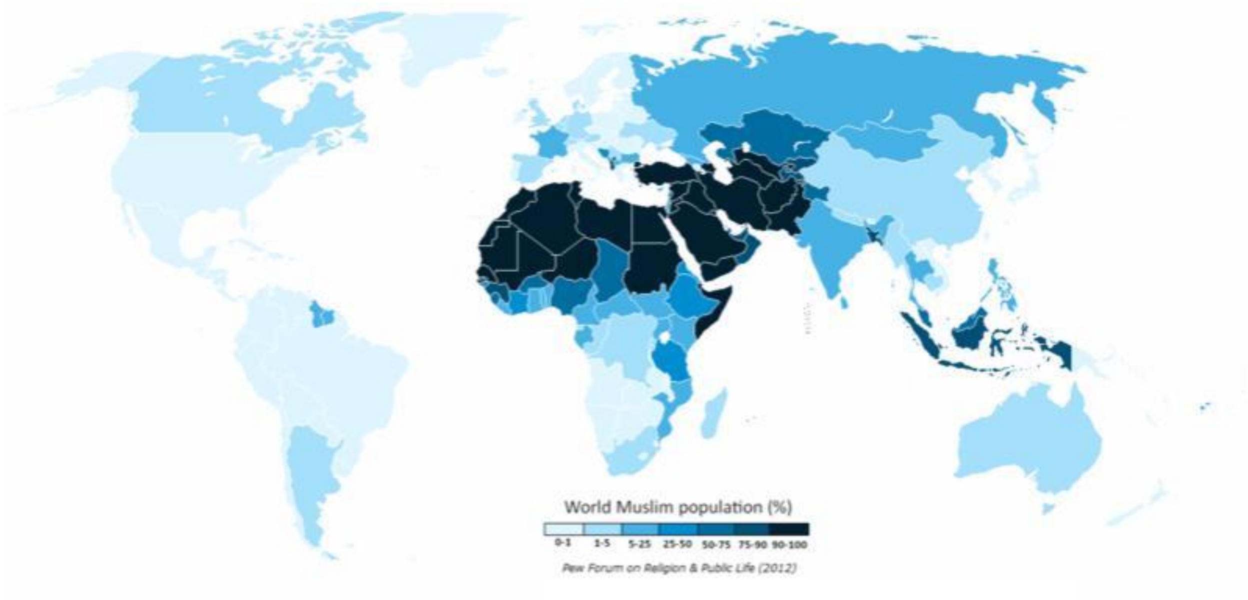

চিত্র : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম জনসংখ্যা (শতাংশের হিসাবে)

তবে পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করেন। এশিয়া মহাদেশে ভারত, চীন, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, বার্মা, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশে বহু সংখ্যক মুসলিম বসবাস করেন। তবে তারা সংখ্যালঘু এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে থাকেন, যেমন চীনের উইঘুর সম্প্রদায়, কাশ্মীরের মুসলিম সম্প্রদায়, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়। আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অমুসলিম দেশ যেমন ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, ঘানা, মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক ও জাম্বিয়ায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম রয়েছেন। ইউরোপের শুধু আলবেনিয়া ছাড়া অন্য সকল দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু। গোটা ইউরোপে প্রায় ১৫ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলিম বসবাস করছেন। অবাক করা বিষয় এই যে, এই ১৫ মিলিয়ন মুসলিমকে খৃষ্টধর্মে দিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের অধীনে প্রায় ১৭ মিলিয়ন খৃষ্টান কর্মরত রয়েছে! এক খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকের উদ্ধত ঘোষণা এই যে, ‘ইউরোপে বসবাসকারী মুসলিমদের অন্তর থেকে ইসলামকে বিলুপ্ত করে দিতে হবে।‘ পৃথিবীর বিভিন্ন অমুসলিম দেশে ছড়িয়ে থাকা বিপুল সংখ্যক মুসলিম শুধু তাদের মুসলিম পরিচয়ের কারণে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখোমুখি হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তাদের দ্বীন-ঈমানও হুমকির সম্মুখীন।

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের অবস্থা

মুসলিমরা যেসব দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে সেসব দেশের পরিসংখ্যানে মুসলিমদের প্রকৃত সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায়না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে দেশে ইসলামি সংখ্যালঘু আছে, সেখানে তাদের পরিসংখ্যান নেই। কোথাও সংখ্যালঘুর পরিসংখ্যান সাম্প্রদায়িক এবং জাতিগত সমস্যা উত্থানের ভয়ে চেপে যাওয়া হয়।

অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিমদের নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। এখানে অঞ্চলভিত্তিক মুসলিম নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হলো :

ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতন

ভারত একটি বহু-জাতিক এবং বহু-ভাষিক সমাজ। এখানে মুসলিমদের অনুপাত মোট সংখ্যার ১৪% । যাদের বেশির ভাগ উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ,মহারাষ্ট্র এবং কেরালা রাজ্যে বসবাস করেন। তাদের ৭০% সদস্য কৃষিকাজ করে। বাকিরা পরিষেবা, বাণিজ্য ও শিল্প খাতে কাজ করে। উত্তর ভারতের মুসলিমরা হানাফি এবং উর্দু-বাংলাভাষী। দক্ষিণ ভারতের মুসলিমরা শাফেয়ী এবং তামিলভাষী। তবে দক্ষিণের কিছু রাজ্যে শিয়া মুসলমানও রয়েছে। সব মিলিয়ে ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘু ১৪% হলেও, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব ১% এর বেশি নয়।

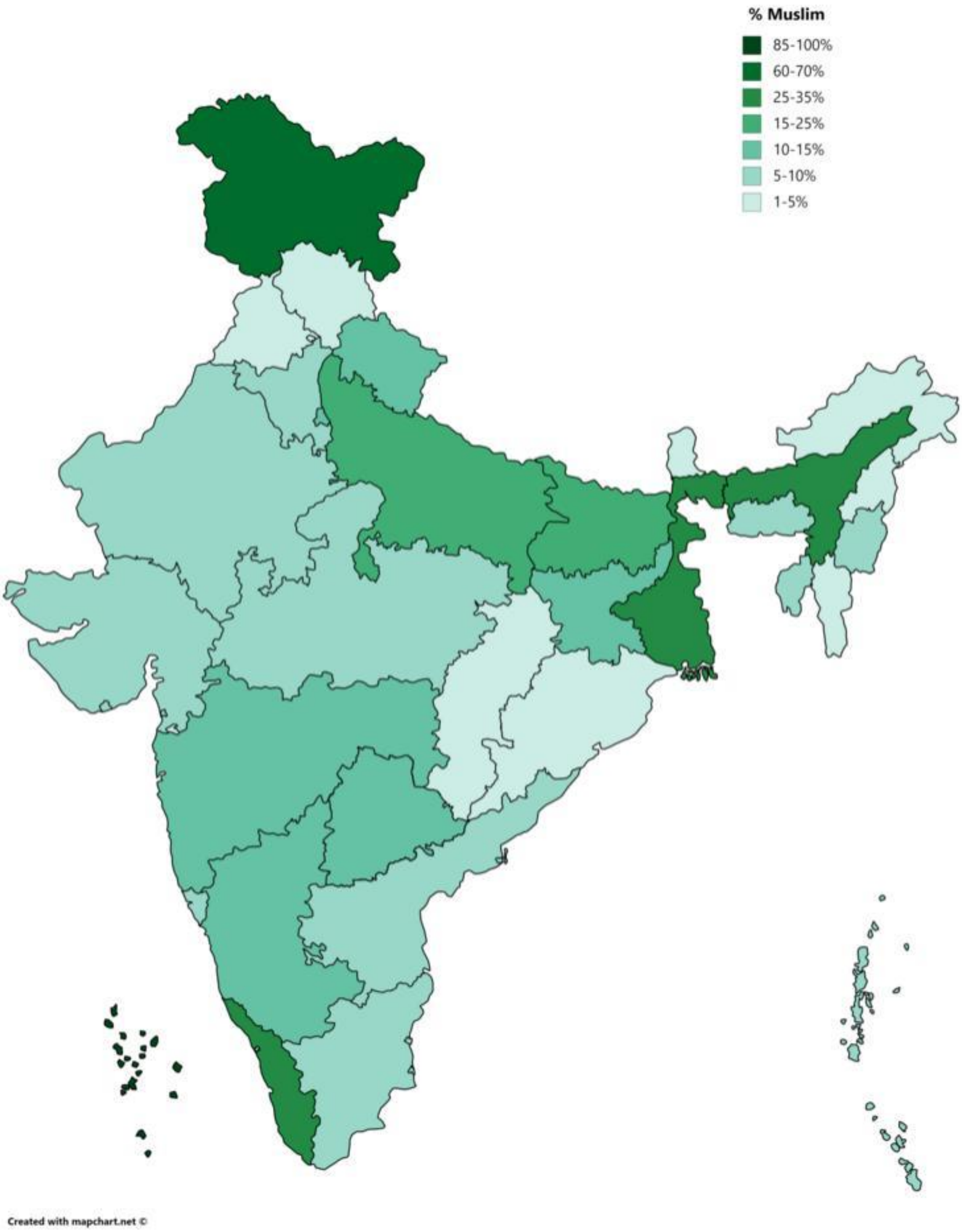

চিত্র : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা (শতাংশ হিসাবে)

মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতনের অন্যতম পীঠস্থান ভারত। হিন্দু-মুসলিম সংঘাত সেখানে লেগেই থাকে। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা হলো - **১৯৮৪** সালে আসামের নেলি গণহত্যা। যেখানে হাজার হাজার মুসলমান শহীদ করা হয়। তারপর **১৯৯২** সালের

ডিসেম্বরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন কর্তৃক বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ঘটনা। মসজিদ ভাঙার পর সৃষ্ট দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল দুই হাজারের বেশি মুসলিম। তারপর ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের রায়, ডিসেম্বরে মুসলিমদের বাদে সব ধর্মকে সুবিধা দিয়ে নাগরিত্ব আইন পাস।

১৯৪৭ সালের পর থেকে কাশ্মীরের মুসলিমদের উপর চলছে নানা রকম নিগ্রহ-নির্যাতন। সম্প্রতি এই নির্যাতন আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে কাশ্মীরী মুসলিমরা নির্যাতন ও অবরুদ্ধতার এক কঠিন জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলিমদের গরু কুরবানী দেয়া নিষেধ, জয় শ্রীরাম বলে মুসলিমদের ওপর হামলা, তাদেরকে দিয়ে জোরপূর্বক ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেওয়ানো হয়, হিজাব-বোরকা পরিহিত মহিলাদের ওপর হামলা করা হয়।

চীনে মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতন

চীনের মুসলিম সংখ্যালঘু ভারতের পরে এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু। চীনের মোট জনসংখ্যার ১১% মুসলিম। চীনা সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, চীনের উত্তর-পশ্চিম রাজ্যগুলোতে মুসলিমদের সংখ্যা প্রচুর। বিশেষ করে জিংজিয়াং (উইঘুর) রাজ্যে ৭১%, সাংহাইয়ে ৬৫%, কানসুতে ৩১%, অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় ২৯% এবং রাজধানী বেইজিংসহ আরও ১২টি রাজ্যে মুসলিমদের অনুপাত ১০% ছাড়িয়েছে। এদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়;

১. তুর্কি জাতিসত্তা : তুর্কিস্তান হলো চীনের সবচেয়ে বড় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদেশ। চাইনিজরা একে শিংজিয়াং বলে থাকে। স্বাধীন দেশ হলে পূর্ব তুর্কিস্তান হতো আয়তনে বিশ্বের ১৮ তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। এই এলাকায় বসবাস করে বিভিন্ন গোত্রের মুসলিম – উইঘুর , কাযাখ, মঙ্গোল , কিরগিজ। এদের মধ্যে উইঘুররা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাযাখ, মঙ্গোল , কিরগিযরা যাযাবর জাতি।

২. চাইনিজ জাতিসত্তা : এদেরলে হুই বলা হয়। বেইজিং তাদের উপস্থিতির অন্যতম স্থান।

৩. অন্যান্য জাতিসত্তা।

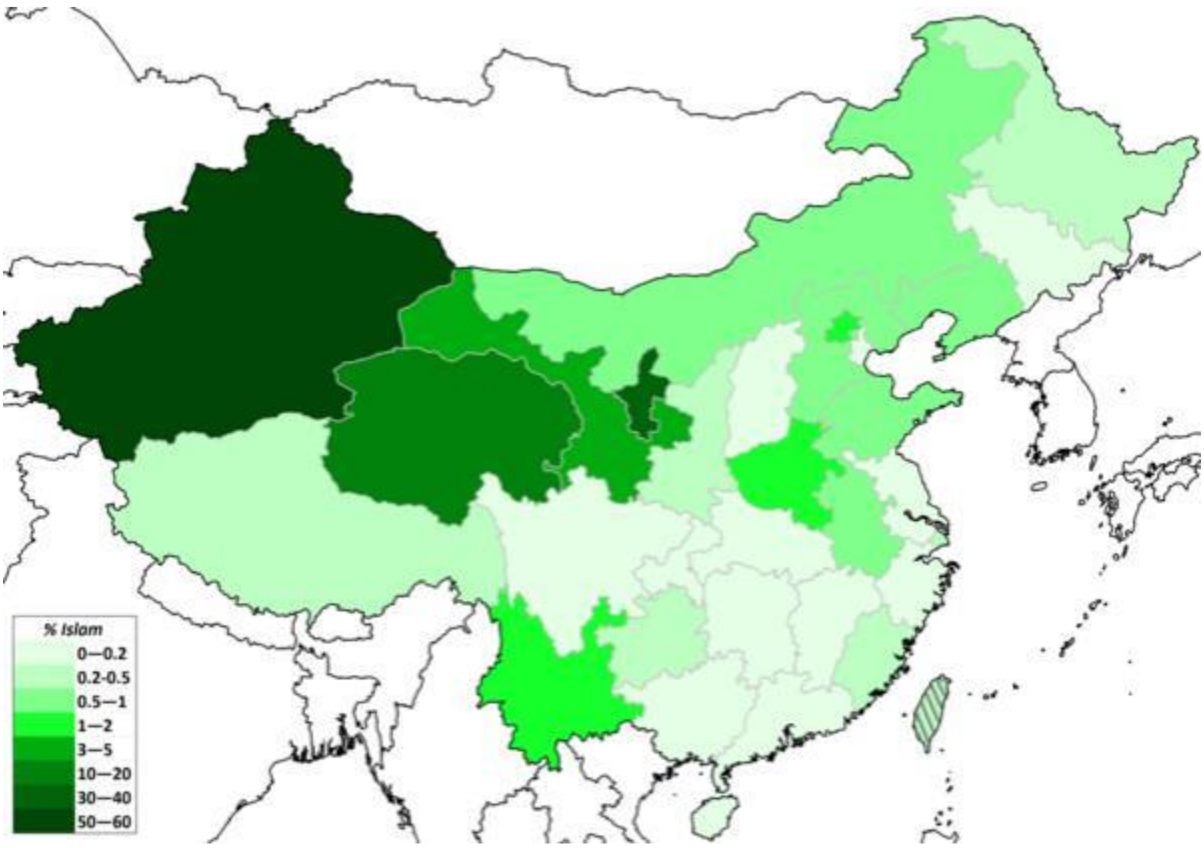

চিত্র : চীনের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা (শতাংশ হিসাবে)

চীন সরকারে তথ্যানুযায়ী, পূর্ব তুর্কিস্তানে বসবাস করে ৭.৫ মিলিয়ন মুসলমান। এর প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে **১৭৫৯** সাল থেকেই অঞ্চলটি দখল করার চেষ্টা করে চীন। **১৯৪৯** সালে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সাফল্যের পর অঞ্চলটি দখল করে ফেললে এর নামকরণ করা হয় 'শিংজিয়াং'। চীনা দখলদারিত্বের প্রতীক 'শিংজিয়াং' নামটিকে উইঘুররা প্রত্যাখ্যান করে। সেই থেকে আবার মুসলিমদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। চীনের উইঘুর এখন বিশ্বের উন্মুক্ত করাগার। সেখানে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে **১০** লাখেরও বেশি মুসলিম। সেখানে গণহত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, গণধর্ষণ, শ্রমদাসত্ব, মেডিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট – এমন কিছু বাকি নেই যা করা হয়না। নিষিদ্ধ করা হয়েছে আরবি ভাষা, কুরআন শেখানোর প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করা হয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ্জ সব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘোষণা দিয়ে কুরআন বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। মসজিদগুলোকে পার্টি হাউস বানানো হয়েছে। প্রতিনিয়ত পোড়ানো হচ্ছে কোরআন-হাদিসের বই। মেয়েরা হিজাব পরলে আটকে দেয়া হয় কারাগারে। শিশুদের মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাদের জীবন্ত শরীর থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে !

মিয়ানমারে মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতন

ইসলামি সূত্র অনুযায়ী, বার্মিজ সরকার মুসলিমদেরকে রাজনৈতিক অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে। যেমন—তারা পাবলিক স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা করতে পারে না। মসজিদের জমিগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কবরস্থানের জন্য ওয়াকফকৃত জমিগুলোতে গড়ে তোলা হয়েছিল স্টেডিয়াম, মঠ। ট্যাক্স হিসেবে বার্মিজ সরকারকে দিতে হত ফসলের বড় একটি অংশ। ২০১৭ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের ওপর চালায় কালের ভয়ংকর গণহত্যা। পুড়িয়ে দেয়া হয় রোহিঙ্গাদের গ্রামের পর গ্রাম। প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে সাড়ে সাত লাখ মানুষ। এর আগেও নির্যাতনের শিকার হয়ে এসেছিল চার লাখেরও বেশি। আন্তর্জাতিক আদালতে শুরু হয়েছে এই গণহত্যার বিচার।

ইউরোপ ও আমেরিকায় মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতন

ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের আকার দেখানোর মতো কোনও আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান নেই। তবে কিছু ইসলামি সূত্রের অনুমান, ইউরোপে ৫০৭ মিলিয়ন জনগণের মধ্যে মুসলিম ৪৪ মিলিয়ন। ইউরোপে মুসলিম সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি এক দেশের থেকে অন্য দেশে পৃথক। সে দেশের আইন ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইসলামি প্রতি প্রচলিত অনুভূতি অনুসারে। কিছু দেশ, যেমন ফ্রান্স এবং জার্মানি মুসলিম সংখ্যালঘুদের সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখে। ফলে তাদের সুযোগ-সুবিধায়ও এর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে মসজিদের জন্য বিল্ডিং পারমিটের সময়। ইউরোপের মুসলিমরা মূলত ব্যক্তি ও সম্পত্তির ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের শিকার। এছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির চাপে ইসলামি সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সবসময় থাকে। তবে সংখ্যালঘুরা চেষ্টা করছে ইসলামি পরিচয় ও সংস্কৃতি ধরে রাখার। ক্ষমতার কমতি ও দাঈ’র শূন্যতা তাদেরকে মাথা উঁচু করতে দিচ্ছে না। আবার তাদের এমন কোন ইসলামি সংগঠনও নেই, যারা সরকারের কাছে সংখ্যালঘুদের অধিকারের দাবি তুলে ধরবে।

আফ্রিকায় মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতন

অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগতে থাকা আফ্রিকার নিম্ন জীবনযাত্রার মান, নিরক্ষতার হার, রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্যও প্রধান সমস্যা। ওয়াশিংটনে জাতিসংঘের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ব ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় ২০০ মিলিয়ন আফ্রিকান অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। সেখানে

আবাদযোগ্য মাটির ক্রমাগত অবনতি, জনসংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি সংকট আরও ঘনিভূত করছে। এছাড়াও নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, কঙ্গো এবং সিওরা লিওনের মতো দেশগুলো আক্রান্ত যুদ্ধে এবং সংঘর্ষে।

আরও ভয়ংকর হলো, আফ্রিকায় মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল সংখ্যক মুসলিমকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলছে। অথচ সেখানে ইসলামি শিক্ষা প্রচারে নেই যোগ্য শিক্ষক ও দাঈ। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক করে দেয়া হয় মুসলিমদের। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিমরা একটু ব্যতিক্রম। তাদের বেশিরভাগ ব্যবসায় জড়িত এবং তাদেরকে ধনী সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে বিবেচনা করা হয়। মুফতি তাকী উসমানীর একটি ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিমরা সেখানকার নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গদের নিকট দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে। সেখানে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে প্রতিটি শহরে মাদ্রাসা তৈরি করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতন

অস্ট্রেলিয়ায় মুসলিমদের অনুপাত মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.১%। এই সংখ্যালঘুদের ইসলামি পরিচয় ও সংস্কৃতি মারাত্মক ঝুঁকির মুখে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হলো, ২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে হামলা।

এছাড়াও আরও অনেক দেশে মুসলিম সংখ্যালঘু আছে। পুরো বিশ্বের মানচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—গণহত্যার কিংবা জাতিগত নিধনের কারণে বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে মিয়ানমার ও চীনের মুসলিম সংখ্যালঘুরা। মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুরা। সাধারণ ঝুঁকিতে রয়েছে ফ্রান্স, ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, আমেরিকার মুসলিম সংখ্যালঘুরা।

মোটকথা, সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার পৃথিবীর অনেক মানবাধিকার সংগঠন। কিন্তু মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিয়ে কথা বলার মতো কণ্ঠ এখনো তৈরী হয়নি। বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও, তাদের ওপর চলমান অত্যাচার নিয়ে কেউ কথা বলে না। অথচ কোথাও কোনো হিন্দু কিংবা খ্রিস্টান আক্রান্ত হলে উঠেপড়ে লাগে পৃথিবীর সকল মানবাধিকার সংগঠন। মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতন যেন পুরো বিশ্বজুড়ে একপ্রকার বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে মুসলিমদের অবস্থা

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের পরিচিতি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে। তবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে যে এখানে মুসলিমদের জীবন খুব সুখকর এমনটা নয়। এদেশে অধিকাংশ মানুষের বাস দারিদ্রসীমার নিচে। পর্যাপ্ত ইসলামিক জ্ঞান ও নেই তাদের। এই সুযোগে বিভিন্ন অমুসলিম দেশের খ্রিস্টান মিশনারির এজেন্ট তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত মানুষ আর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে তাদেরকে দলে দলে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। সেই মানুষগুলো এতটাই অসহায় আর দ্বীনি জ্ঞান এতটাই কম যে তারা দু'মুঠো ভাতের জন্য নিজ ধর্ম ত্যাগ করছে।

এছাড়াও বাংলাদেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু না হয়েও তারা নানা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শিরক-কুফরের মতো নানা পাপাচারে ছেয়ে আছে এদেশের গ্রামাঞ্চলগুলো। আর শহরগুলোতে চলছে অশ্লীলতা, ফ্রি মিক্সিং, পাশ্চাত্য কালচার প্রভৃতি।

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

অমুসলিম দেশে বসবাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সেসব দেশের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হয়। তাই ফকিহরা অমুসলিম দেশগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন এবং সংজ্ঞায়িত করেছেন:

১. প্রবল ইসলামবিদ্বেষী দেশ : যেসব অমুসলিম দেশে ইসলাম ধর্ম পালন করার ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা ও জীবনের নিরাপত্তা নেই সেগুলো এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশে বাস করা মুসলিমদের জন্য খুবই কঠিন, যেমনটা ছিল নবীজীর হিজরত-পূর্ব মক্কিজীবন। ইসলামি মতাদর্শের শত্রু কাফির ও মুশরিকদের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করে ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন।

যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে এ ধরনের অমুসলিম দেশে বসবাস না করে, যে রাষ্ট্র মুসলিম কতৃত্বাধীন ও ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা পরিচালিত, সে রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করাই উত্তম, নাহলে কঠিন গুনাহ হবে। কারণ যে রাষ্ট্রে ইসলামের কতৃত্ব নেই, সেখানে মুসলিম বসবাস করা নিষিদ্ধ ও হারাম। [মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, খ. ৩, পৃ. ১১]

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।“ [সূরা নিসা : ৯৭]

তবে ফকিহদের মতে, হিজরত করার মত সামর্থ্য না থাকলে মুসলিমদের জন্য এসব দেশে বসবাস করা জায়িজ। সেক্ষেত্রে তাদের কোনো গুনাহ হবেনা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

“কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।“ [সূরা নিসা : ৯৮]

২. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে যেসব দেশ : যেসব অমুসলিম দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু, তবে তাদের ইসলাম ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়না। অধিকাংশ ফকিহদের মতে, এমন দেশে বসবাস করা জায়িজ। এ নিয়ে বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

তবে এমন দেশে অবস্থানের ক্ষেত্রেও শর্ত হলো নিজের, পরিবারের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বিনদারির ব্যাপারে আশঙ্কা না থাকা এবং বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে ঈমান ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা তৈরি না হওয়া। যদি সেখানে যাওয়ার পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। জীবন সেখানে যতই প্রাচুর্যময় হোক না কেন। কেননা আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“বলো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।“ [সূরা তাওবা : ২৪]

অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিবেচনায় অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আলেমগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১. মুসলিম রাষ্ট্রকে কর প্রদানকারী অনুগত রাষ্ট্র : যেসব অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রকে কর প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখার অধিকার লাভ করেছে।

২. চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র : যেসব অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের চুক্তি বহাল আছে।

৩. বিদ্রোহী রাষ্ট্র : মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ যে অমুসলিম রাষ্ট্র চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে শত্রুতামূলক আচরণ করে।

৪. চুক্তিহীন রাষ্ট্র : মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যে অমুসলিম রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে চুক্তিবদ্ধ নয়, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ থেকে বিরত থাকে।

৫. যুদ্ধরত রাষ্ট্র : মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যে অমুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধাবস্থা বা শত্রুভাবাপন্ন অবস্থা বিরাজমান।

অমুসলিম দেশে বসবাসের কারণ

বিভিন্ন কারণে মুসলিমদের অন্যান্য দেশে যেতে হয়। তার মধ্যে প্রধান কিছু কারণ হলো - রাজনৈতিক নিরাপত্তা অর্জন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা, উপার্জন, উচ্চশিক্ষা অর্জন, চিকিৎসা, পর্যটন, আল্লাহর পথে দাওয়াতের উদ্দেশ্য, প্রভৃতি। এক্ষেত্রে সবাই মুসলিম দেশে যাওয়ার সুযোগ পান না। অমুসলিম দেশগুলোতেও যেতে হয় অনেককে। তাদের অনেকেই দীর্ঘদিনের জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করেন। আবার কেউ কেউ অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বও গ্রহণ করেন। অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো ঈমান রক্ষা করা। ঈমান রক্ষা ও দ্বীন পালনের প্রধান হাতিয়ার হলো ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করা।

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের গমন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিভিন্ন বিধান রয়েছে। কারণ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল মেনে চলতে হয়। কারণ পরিবর্তনের ফলে বিধানেও ভিন্নতা হবে।

অমুসলিম দেশে বসবাসের বিধান

অমুসলিম দেশে বসবাসের কারণের ভিত্তিতে বসবাসের বিধানগুলো আলোচনা করা হলো –

১. রাজনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে বসবাস

অনেক সময় রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোনো কারণে মুসলিমদের জন্য নিজের দেশে বসবাস করা অনিরাপদ হয়ে যায়। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদেরকে অত্যাচারের শিকার হতে হয়। যদি অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে জীবন বাঁচানোর তাগিদে অমুসলিম দেশে বসবাস করা জায়িজ আছে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে –

- ❖ অমুসলিম দেশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করা যায় এবং ইসলামী শরীয়ত মেনে চলা যায়।
- ❖ অমুসলিমদের এমন কোনো কাজে সহায়তা করা যাবেনা , যা মুসলিম জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ।

নবীজী রাসূল (সা:) - এর বাণী থেকে পাওয়া যায় :

" যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম পালনের জন্য এক স্থানে থেকে পালিয়ে অন্য স্থানে যায় আর এ কারণে এক বিঘত জমিও হারায়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" [আল-জামিও লি-আহকামিল কুরআন]

২. মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করে বসবাস

একজন মুসলিম হয়ে অন্য মুসলিমের বিরুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করা নিঃসন্দেহে একটি নিকৃষ্ট কাজ। তাই কেউ যদি অমুসলিম বসবাস করে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো কাজে অংশ নেয়, সেক্ষেত্রে তাঁর জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করা হারাম ও নাজায়িজ। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনে আছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ

“হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।“ [সূরা মায়িদা : ৫১]

৩. উপার্জনের উদ্দেশ্যে বসবাস

ইবাদত করা যেমন ফরজ, ঠিক তেমনি হালাল রুজি অন্বেষণ করাও ফরজ। আল্লাহ পাকের নির্দেশ দিয়েছেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।“ (সূরা জুমুয়া-১০)

জীবিকা উপার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। কেউ চাকরি করেন, কেউবা ব্যবসা বাণিজ্য করেন। আবার অনেকে দেশের বাইরে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে কাজ করতে যান। এক্ষেত্রে সবাই মুসলিম দেশে যাওয়ার সুযোগ পান না। অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও যেতে হয় অনেককে।

সাধারণভাবে জীবিকার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে যাওয়া উচিৎ নয়। কেননা এতে তাদের দ্বারা দ্বীন প্রভাবিত হ’তে পারে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন :

‘মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হ’তে মুক্ত’ [আবুদাঊদ হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩৫৪৭]

তবে উপার্জনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে বসবাস অধিকাংশ আলিমের মতে জায়িজ। সেক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে :

১. নিজের দেশে উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলে এবং খুব অভাবগ্রস্ত হলে বাধ্য হয়ে অমুসলিম দেশে বসবাস করা জায়িজ। পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।“ [সূরা মূলক : ১৫]

২. নিজের দেশে উপার্জনের সুযোগ থাকলেও পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অমুসলিম দেশে গিয়ে উপার্জন করা জায়িজ রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

"তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষন করায় কোন পাপ নেই।" [সূরা বাকারা : ১৯৮]

৩. নিজের দেশে যদি বিষয় ও কাজের চাহিদা না থাকে, সেক্ষেত্রে অমুসলিম দেশে বসবাস করা জায়িজ আছে।

৪. হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী জ্ঞান থাকতে হবে।

৫. প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ঈমানী জোর থাকতে হবে।

মোটকথা, উপার্জনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে বসবাস করতে শরীয়তে তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তাছাড়া মুসলিম দেশসমূহে কর্মক্ষেত্রের যে অভাব, তাতে মুসলিমদের উন্নত দেশে কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়া খারাপ কিছু নয়। বরং মুসলিমরা যদি ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে কর্মক্ষেত্রে কাজ করে, তাহলে মুসলিমদের জীবনব্যবস্থা দ্বারা অমুসলিমরা প্রভাবিত হবে। এতে উপার্জনের পাশাপাশি ইসলামের দিকে দাওয়াতের সম্ভাবনাও রয়েছে। নবীজীর সময়ে ব্যবসার কারণে ইসলামি কাফেলা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছে। এসব কাফেলার মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছেছে। বর্তমান বিশ্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য দাওয়াতের একটি মাধ্যম। তাই দাওয়াতের এই মাধ্যমকে অনুসরণ করা উচিত।

তবে কতিপয় আলিমের মতে, পার্থিব উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে বসবাস জায়িজ নয় [মুকাদ্দামাত, ইবনু রুশদ : ৯/৩১৫৯; আল-মুহাল্লা : ১১/৩৪৯]।যদি স্বদেশে কোন ব্যক্তির এই পরিমাণ জীবিকার বন্দোবস্ত থাকে, যার মাধ্যমে সেই স্থানে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষের জীবন চলার মান অনুযায়ী সেও চলতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারপরও শুধু জীবন চলার মান আরো উন্নত করার উদ্দেশ্যে, সম্পদ বৃদ্ধি এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে থাকে, তাহলে এ জাতীয় হিজরত মাকরুহর আওতাভুক্ত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কোনরূপ ধর্মীয় বা পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া সেই রাষ্ট্রে বসবাস তাদের প্রচলিত অপসংস্কৃতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ারই নামান্তর হবে। বিনা প্রয়োজনে নিজের ধর্ম ও চরিত্রকে বিসর্জন দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবল আরাম-আয়েশ এবং ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে, তার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল হয়ে যায় এবং খুব দ্রুতই এ ধরনের মানুষ বিধর্মীদের আচার-আচরণের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।

৪. উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে বসবাস

বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই তুলনায় মুসলিম দেশগুলো একটু পিছিয়ে আছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে সভ্যতার শুরু থেকেই বিধর্মীরা নতুন কিছু না কিছু আবিষ্কার করে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করছে। তাদের এই মূল্যবান জ্ঞান শুধুমাত্র পার্থিব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম জাতি তাদের জ্ঞানকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে। তাই মুসলিমদের উচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন- চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, প্রকৌশল, স্থাপত্য, পরমাণুবিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গবেষণা প্রভৃতিতে জ্ঞান অর্জন করা। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত মুসলিমরা নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে পারবেন না, চিরকাল অমুসলিমদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতে জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[সূরা আলাক্ব : ১]

রাসূল (সাঃ) জ্ঞান অর্জন করাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে অন্য দেশে যাওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন :

مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করার জন্য (ঘর থেকে) বের হলো, সে ফেরত আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকল।" [তিরমিজি]

অর্থাৎ, জ্ঞান অর্জনকারী বা একজন ছাত্র যতক্ষণ জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করে ততক্ষণ সে আল্লাহর পথেই থাকে। তবে এখানে জ্ঞান দ্বারা উপকারী জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইসলামি জ্ঞান (ইলমে দ্বীন) এবং এমন পার্থিব জ্ঞান যা অর্জন করা ইসলামে জায়িজ ও যার দ্বারা মুসলিমজাতির উন্নতি সাধিত হবে। বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন দেখে মনে হয়, জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে বসবাস করা অতীব জরুরি। অবশ্য তাতে কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক :

(১) ব্যক্তির কাছে এমন জ্ঞান থাকা চাই যে জ্ঞান দিয়ে সে সংশয়গুলোকে প্রতিহত করতে পারবে। কেননা অমুসলিম দেশগুলোতে তারা মুসলিমদের কাছে নানারকম সংশয় উপস্থাপন করে, যাতে করে তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে সরিয়ে নিতে পারে। যেমন – ফ্রি মিক্সিং, লিভ ইন রিলেশনশিপ, ট্রান্সজেন্ডারিজম, এলজিবিটিকিউ আন্দোলন প্রভৃতি।

(২) ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম এমন দ্বীনদারি থাকা। দুর্বল দ্বীনদারি নিয়ে সেখানে যাবে না। গেলে সে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির কাছে হেরে গিয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে।

(৩) বিদেশে গিয়ে পড়ার প্রয়োজন সাব্যস্ত হওয়া; যদি এই বিষয় মুসলিম দেশে না থাকে।

(৪) ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জনের জন্য অমুসলিম দেশে যাবে, উম্মাহর কাছে এর প্রয়োজন থাকতে হবে এবং সেই জ্ঞান শরিয়ত বিরোধী হতে পারবে না।

(৫) ব্যক্তি যে দেশে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, সেখানে ছাত্রদের ধর্মীয় গবেষণার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

যদি এই শর্তগুলো পরিপূর্ণ থাকে তাহলে সে ছাত্র অমুসলিম দেশে যেতে পারে। যদি এগুলোর কোন একটি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে ব্যক্তির জন্য সফর করা অনুচিত। কারণ দ্বীনদারি রক্ষা করা অন্য যে কোন কিছু রক্ষা করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৫. আল্লাহর পথে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বসবাস

নববী সময় থেকে মুসলিমরা নিজেদের দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে বসবাস করেছেন এবং নিজেদের চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে ইসলামের বাণী পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবেই পৃথিবীতে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। পৃথিবীর সকল জাতির কাছে দাওয়াত পৌঁছানো এই উম্মাহর ওপর ফরজে কিফায়া। কারণ মুসলিমজাতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো উম্মাহর প্রতি দরদ। একজন মুসলিম কখনোই মেনে নিতে পারেনা যে তার আরেক ভাই দাওয়াতের অভাবে ইসলামের ছায়াতলে না এসে চিরকাল আগুনে জ্বলবে। আর মুসলিমরাই যদি দাওয়াতের এই দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে তো অমুসলিমরা কখনোই শান্তির ধর্মে আসতে পারবে না। তাই অমুসলিম দেশে ভ্রমণ বা বসবাসের উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহর পথে দাওয়াত, তাহলে তা শুধু জায়িজ নয়, বরং মুস্তাহাব। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।“ [সূরা তাওবা : ১২২]

অর্থাৎ, মুসলিমদের একটি দলের অবস্থান অমুসলিম দেশে থাকা আবশ্যক, যারা দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সেখানে অবস্থান করবে এবং সেই দেশের মানুষের কাছে ইসলামি শিক্ষা পৌঁছে দেবে।

উদাহরণস্বরূপ, অতীতে ইন্দোনেশিয়া ছিল বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও হিন্দুপ্রধান দেশ। দেশটির বহুসংখ্যক দ্বীপের একটিতে অধিবাসীদের কোনো সুস্পষ্ট ধর্ম ছিল না। অধিকাংশ ছিল প্রকৃতি পূজারী ও ধর্মহীন। বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ছিল। দ্বীপবাসীদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন ছিল না। সেই সময় কতিপয় আরব বণিক সেই দ্বীপে বসবাস শুরু করেন। তারা দ্বীপের অধিবাসীদের বুঝিয়ে তাদের মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করে এবং বিয়ের প্রচলন শুরু করে। তাদের প্রচেষ্টার ফলে সেই দ্বীপে ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয় এবং তারা সফল হন। কালক্রমে অন্যান্য দ্বীপেও ইসলাম প্রচার শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ। অতএব, দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. চিকিৎসার জন্য বসবাস

কেউ অসুস্থ হলে নিজ দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়া অসম্ভব হলে অমুসলিম দেশে বসবাস করে চিকিৎসা করানো জায়িজ [ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল লিল মুসাফিরিন : ৩৯]। উদাহরণস্বরূপ, চেন্নাই, মাদ্রাজ, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায় বাংলাদেশের অনেকেই সেখানে চিকিৎসার জন্য যায়।

৭. পর্যটনের উদ্দেশ্যে বসবাস

দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে যাওয়া এবং সেখানে সাময়িক অবস্থান করা অধিকাংশ আলিমের মতে জায়িজ [আহকামুল কুরআন : ১১/৪৮৬]। কারণ দেশ ভ্রমণ মূলত নাজায়িজ নয়, বরং বিভিন্ন কারণে তা প্রশংসিত। ভ্রমণের কারণে আল্লাহর এমন অনেক নিয়ামত সামনে আসে, যা দ্বারা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পায়, যেমন : পশু-পাখি, পাহাড়, সমুদ্র, জলপ্রপাত প্রভৃতি। অনেক সময় ভ্রমণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা বা আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। ভ্রমণের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" [সূরা আনকাবুত : ২০]

তবে অমুসলিম দেশে ভ্রমণকারীদের কিছু শর্ত মেনে চলা আবশ্যক :

(১) নিজের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ করে চলতে হবে।

(২) নিজেকে সকল প্রকার পাপের কর্ম থেকে হিফাজত করতে হবে।

(৩) এমন স্থানে যেতে হবে হবে যেখানে শরয়ীভাবে নাজায়িজ বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ভয় নেই। যেমন– হারাম খাদ্যগ্রহণ, বেপর্দায় চলাফেরা প্রভৃতি।

(৪) অর্থ ও সময় অপচয় করা যাবে না।

(৫) সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণ করতে হবে। যেমন- আল্লাহর নিদর্শনাবলি পরিদর্শন করা।

যদি এই শর্তগুলো পূরণ করা সম্ভব হবে না বলে নিশ্চিত ধারণা হয়, তবে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। কেননা দুনিয়া পাওয়ার জন্য আখিরাতকে হারানো মুমিনের জন্য বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। নিতান্তই যেতে বাধ্য হ'লে সেখানে গিয়ে নিজের আক্বীদা ও আমলগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। অন্যদের সাথে মিশতে হ'লে তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে মিশতে হবে। কোন অবস্থাতেই অমুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া যাবে না। তাদের সামঞ্জস্য অবলম্বন করা যাবে না। তাহ'লে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে [মিশকাত হা/৪৩৪৭]। তাছাড়া রাসূল (সাঃ) মুশরিকদের মাঝে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলিম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন [আবুদাঊদ হা/২৬৪৫, তিরমিযী হা/১৬০৪]। অর্থাৎ, মুসলিম পরিবেশেই তাকে থাকতে হবে। বিরোধী পরিবেশে থেকে ঈমান হারালে সে দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

৮. নাগরিকত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস

নাগরিকত্ব হলো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক বিশেষ রাজনৈতিক ও আইনগত সম্পর্ক, যার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। যেমন বাংলাদেশি, ভারতীয়, আমেরিকান ইত্যাদি।

কোন মুসলিম অমুসলিম দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করা, সে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা এবং সে দেশের নাগরিকদের সমান আবাসন সুযোগ এবং সমান নাগরিক সুবিধা গ্রহণ করে স্বতন্ত্রভাবে নিজের আবাসস্থল গড়ে তোলা, এমন একটি বিষয় যার হুকুম স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এবং বসবাসকারীদের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাধারার ভিন্নতার কারণে

বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ বিষয়ে সমকালীন আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে এবং বর্তমানে লেখক ও গবেষকদের মধ্যে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে।

(ক) নাজায়িজের দলিল

- রাশিদ রেজা মিসরি, শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ আদ-দাজাবি, শায়খ মুহাম্মাদ শাকির, আল্লামা মোস্তফা আল-ঝারকা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মান্না আল-কাত্তান, ড. আবদুল করিম জাজায়িরি এবং বৈরুতের যুগশ্রেষ্ঠ মুফতি শায়খ ইদরিস শরিফ মাহফুজ প্রমুখ আলিম মুসলিমদের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকে হারাম বলেছেন। মিসরের বিখ্যাত আলিম ও ধর্মতাত্ত্বিক হাসান আল-বান্না বিষয়টিকে 'আকবারুল কাবায়ির' (জঘণ্যতম কবিরা গুনাহ) বলেছেন। তাদের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী :

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ

"মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না।" [সুরা আলে ইমরান : ২৮]

অর্থাৎ, যে মুসলিম কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবে সে ইসলামের আওতা থেকে বেরিয়ে যাবে এবং সে একজন মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

- মাজমাউল ফিকহিল ইসলামির রুকন শায়খ মুখতার সালামি, মাসজিদুল হারামের প্রসিদ্ধ ইমাম ও খতিব শায়খ মুহাম্মাদ আবদিল্লাহ ইবনু সাহল প্রমুখ প্রসিদ্ধ আলিমগণের মতে, অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী মুসলিমকে মুরতাদ বলা না গেলেও তার কাজটি একটি গুনাহের কাজ বলে গণ্য হবে।

- আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।" [সূরা নিসা : ৬০]

অর্থাৎ, অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব অর্জনের অর্থ হলো ইসলামি নীতিমালা থেকে বের হয়ে শয়তানের নীতিমালার মধ্যে প্রবেশ করা। এটি ইসলাম বিমুখীতারই নামান্তর।

- আল্লাহ বলেন :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা আল ইমরান : ৮৫]

অর্থাৎ, যারা ইসলামি রাষ্ট্র ছেড়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে যাবে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে।

- পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়িদা : ৫১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।" [সূরা তাওবা : ২৩]

উপর্যুক্ত আয়াত দুটি থেকে বোঝা যায় যে, অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের অনুসরণ করাকে জুলুম করা বোঝায়। আর অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করার অর্থও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের নিয়মনীতির অনুসরণ করা। সুতরাং অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন জায়িজ নয়।

- অমুসলিম দেশে বসবাসের ব্যাপারে নবীজি (সাঃ) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

نا بربي من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله لم؟ قال لا ترى أي ناراهما .

"আমি সেসব মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী? জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইসলামের অগ্নি আর কুফুরের অগ্নি একই সঙ্গে থাকতে

পারে না। তোমরা এটি পৃথক করতে পারবে না যে, এটি কি মুসলমানদের অগ্নি না মুশরিকদের অগ্নি“ [সুনানু আবি দাউদ : ২৬৪৫; সুনানুত তিরমিজি : ১৬০৪]।

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে, এই হাদিসটির সারমর্ম হল এই যে, আল্লাহ তাআলা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরকে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা জায়িজ নেই। কেননা যখন মুশরিকরা তাদের বিজয়ের মশাল প্রজ্বলিত করবে, আর তাদের সঙ্গে মুসলিমরা নীরবতা অবলম্বন করে থাকবে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিই মনে হবে যে, মুসলিমরা এদেরই অন্তর্ভুক্ত। ওলামায়ে কেরামের এই ব্যাখ্যা দ্বারা একথাও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন মুসলিম ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও অমুসলিম রাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন, তাহলে তার জন্য সেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা মাকরূহ।

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন,

من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

“কেউ কোনো মুশরিকদের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো“ [সুনানু আবি দাউদ : ২৭৮৭]।

উল্লিখিত হাদিসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসরা বলেন, মুসলিমরা অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে। বিশেষত যখন তার ঈমান হুমকির মধ্যে পড়ার ভয় থাকে।

রাসূল (সাঃ) আরেকটি হাদিসে বলেছেন,

لا تتركوا الذرية ازاء العدو.

“নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেবে না” [সুনানু আবি দাউদ]।

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবলমাত্র চাকরি করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলিমের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং তাদের জনসংখ্যা বর্ধিত করার কারণ হওয়া এমন একটি (ধিকৃত) কাজ, যার দ্বারা তার বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় ।

- কোনো মুসলিম যখন অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে সেখানে বসবাস করে, তখন তাকে সেই রাষ্ট্রের নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়, যেখানে ইসলামি শরিয়তবিরোধী অনেক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। তখন একজন মুসলিমকে শরিয়তবিরোধী কাজে অংশগ্রহণ করতে হতে পারে, যেমন মুসলিম রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইত্যাদি। সুতরাং অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস কোনোভাবেই জায়িজ নয়।

- মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. এর মতে, কোন ব্যক্তি যদি সমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অন্য মুসলমানের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা দারুল কুফরের নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের জাতীয়তা গ্রহণ করে অথবা তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চাল-চলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের মত হয়ে যাওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে, তাহলে এ জাতীয় যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোন দলিল পেশ করা প্রয়োজন নেই [ফিকহি মাকালাত : ১/২৪৮]।

(খ) জায়িজের দলিল

- অধিকাংশ আলিমের মতে, মুসলিমদের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়িজ। তবে জায়িজ বলা আলিমদের মধ্যে দুটি দল রয়েছে। প্রথম দলের মতে প্রয়োজন বশত অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়িজ, আর দ্বিতীয় দলের মতে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ (স্থান, কাল ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে)। প্রথম দলের আলিমদের মধ্যে আছেন ওমানের বিখ্যাত মুফতি শায়খ আহমাদ ইবনু আহমাদ খলিলি এবং দ্বিতীয় দলে আছেন আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আল আজহারের আল-কুল্লিয়াতুশ শারইয়া ওয়াল-কানুনের রুকন মুহাম্মাদ রাফাত উসমানি, ড. ওহবা জুহাইলি এবং আল্লামা মুফতি তাকী উসমানির মত সমকালীন অধিকাংশ আলিম।
- আলিমগণ দলিল হিসেবে কুরআনের এমন আয়াতগুলোকে দেখিয়েছেন, যেগুলো ইসলামের বিশ্বজনীনতা, সার্বিকতা ও প্রাধান্যের দিকে ইঙ্গিত করে। যেমন :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“তিনি তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।“ [সূরা সাফ : ৯]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।“ [সূরা আম্বিয়া : ১০৭]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।“ [সূরা সাবা : ২৮]

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।“ [সূরা নাহল : ১২৫]

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।“ [সূরা ইউসুফ : ১০৮]

এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর প্রতিটি কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব। মুসলিমরা যদি ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন তাহলে ইসলামের দাওয়াত অমুসলিম রাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কেউ থাকবেনা। এ নিয়তে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা শুধু জায়েযই নয় বরং এটি একটি বিরাট সওয়াবের কাজ। অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীর জীবনাদর্শ থেকে এই মহৎ শিক্ষা পাওয়া যায়। তারা শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও অমুসলিম দেশে ইসলাম প্রচার করে গেছেন। পরবর্তীকালে এগুলো তাদের জীবনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পরও জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয়ের আগ পর্যন্ত একজন অমুসলিম কর্তৃক শাসিত অমুসলিম দেশ হাবশায় অবস্থান করেন। এতে প্রমাণিত হয়, দ্বীন প্রচারের স্বার্থে অমুসলিম দেশে বসবাস করা বৈধ। পবিত্র কুরআনেও দ্বীন প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়িদা : ৬৭]

- আল্লামা ড. ইউসুফ আল-কারযাভী সহ বহু আলিম মনে করেন, যদি অমুসলিম দেশের পরিবেশ ঈমান ও ইসলামের জন্য বৈরী না হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান রক্ষার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায়, তবে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের অবকাশ আছে। কেননা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না এমন অমুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো :

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা মুমতাহিনা : ৮]

- যদি কোন মুসলমানের ওপর স্বদেশে কোন অন্যায় অভিযোগ ও অপরাধ ছাড়াই অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়, বেআইনিভাবে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয় অথবা তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়; এমতাবস্থায় কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া এসব জুলুম অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার যদি কোন পথ খোলা না থাকে, তাহলে এই অবস্থায় ওই ব্যক্তির জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং সেই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তথায় অবস্থান করা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। তবে শর্ত হল এই যে, তাকে এ ব্যাপারে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে সেখানে গিয়ে তার জীবন চলার পথে ধর্মীয় অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলবে। সেখানকার প্রচলিত যাবতীয় মন্দকাজ ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

এর দলিল হলো, সাহাবাগণ মক্কায় কুরাইশদের কাছে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তখন হাবশায় কাফেরদের রাজত্ব চলছিল। তখন সাহাবায়ে কেরাম সেখানে অবস্থান করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী সেখানে অবস্থান

করেছিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) খায়বার যুদ্ধের সময় ফিরে এসেছিলেন। তখন ছিল হিজরী সপ্তম বছর। আর মানুষের আত্মিক অধিকার হল যে, সে তার নফস বা আত্মাকে যে কোন ধরনের অন্যায় ও জুলুম থেকে নিরাপদে রাখবে। সুতরাং যদি সে কোন কাফের রাষ্ট্র ছাড়া নিজের জন্য কোন নিরাপদ স্থান না পায় তাহলে তার জন্য সেখানে হিজরত করাতে কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হবে এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

- যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে চরম সঙ্কটে নিপতিত হয়; এবং বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও যদি নিজের মুসলিম রাষ্ট্রে জীবিকানির্বাহের কোন সুযোগ সৃষ্টি না হয়, এমনকি এখানে সে এক মুঠো খাবারেরও মুখাপেক্ষী হতে হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে তার বৈধ কোন চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়, আর এই সুযোগে যদি সে সেই অমুসলিম দেশে বসবাস শুরু করে দেয়, তাহলে তার জন্য সেখানে বসবাস করা জায়িজ হবে। কেননা অন্যান্য ফরয সমূহের মধ্যে হালাল উপার্জনও একটি অন্যতম ফরয। যার জন্য শরিয়ত কোন স্থান বা কোন জায়গাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়নি; বরং এর জন্য রয়েছে ব্যাপকতর সাধারণ অনুমতি। পবিত্র কুরআনের আয়াতে হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য যে কোন স্থানে গমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।“ [সূরা মূলক : ১৫]

- এ ছাড়া অমুসলিম দেশের মুসলমানের নাগরিকত্ব গ্রহণের ইতিবাচক প্রভাবও আছে। কেননা তা অমুসলিম দেশে ইসলামের অস্তিত্বকে দৃঢ় করে এবং ইসলাম প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধি করে। মুসলিমদের অবস্থানের ফলে সেসব দেশে মাদরাসা-মক্তব-মসজিদের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যা স্থানীয়দের ইসলাম সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করে এবং ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। বিপরীতে ইসলাম ও মুসলিমের অনস্তিত্ব ইসলাম প্রসারের পথ রুদ্ধ করে। যা বৈশ্বিক ধর্ম ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মোটকথা, সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের জন্য ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে বসবাস করা সর্বোত্তম। শুধুমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে অমুসলিম রাষ্ট্রে সাময়িক বা স্থায়ী বসবাস করা যেতে পারে। কেউ যদি সেসব রাষ্ট্রে নিজ দেশের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থা লাভ করে তাহলে তাঁর জন্য সেখানে বসবাসের অনুমতি রয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে :

১. অমুসলিম দেশে বসবাস করতে গিয়ে নিজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়া যাবে না। অমুসলিম দেশে বসবাস মুসলিমের দ্বীনের জন্য কল্যাণকর তখনই হবে, যখন সে তার যাপিত জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং তার পরিবারকে দ্বীনের বিধান অনুসারে পরিচালনা করবে, যেন তার সমগ্র জীবনেই দ্বীন প্রস্ফুটিত হয়। দ্বীন পালন বিঘ্নিত হলে সেখানে বসবাস করা জায়িজ হবে না। এমতাবস্থায় নিজ দেশে ফিরে যাওয়া ওয়াজিব।

২. মুসলিমদের উচিত অমুসলিম দেশে ইসলামের সুন্দর জীবনাদর্শের প্রতীক হওয়া, যাতে করে তাদের চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা অমুসলিমরা প্রভাবিত হতে পারে।

৩. অন্য দেশে গমনকে মনে মনে পবিত্র হিজরত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ফলে ওই ব্যক্তির প্রবাসজীবন সুন্দর ও পূণ্যময় হবে এবং তার মাধ্যমে অমুসলিমদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধিত হবে।

৪. প্রবাসী মুসলিম সর্বদা নিজেকে ও নিজের পরিবারকে অমুসলিম রাষ্ট্রের সকল নেতিবাচক প্রভাব থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করে চলার চেষ্টা করবেন।

অমুসলিম দেশে দৈনন্দিন জীবনযাপন

অমুসলিম দেশে খাদ্যাভাস

অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের খাবার নিয়ে অনেক রকম বিপদে পড়তে হয়। সেসব দেশের বেশিরভাগ খাবারে হারাম দ্রব্য (যেমন - শূকরের চর্বি, মদ ইত্যাদি) মিশ্রিত থাকে। কখনো কখনো ভাষা না জানার কারণে উপাদান হালাল নাকি হারাম সে বিষয়ে অজানা থেকে যায়। জবাইকৃত প্রাণী হালাল উপায়ে জবাই করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ দেখা দেয়। উন্নত দেশগুলোতে কৌটাজাত খাদ্য (মাছ, গোশত) পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া হলো, যেসব খাবার মুসলিম দেশ থেকে এবং মুসলিম প্রতিষ্ঠান থেকে আমদানি করা হয়, সেগুলো কিনে খাওয়া জায়িজ। আর যেগুলো অন্য অমুসলিম দেশ থেকে আমদানি হয়, সেগুলো বর্জন করতে হবে। এছাড়া প্যাকেটজাত খাবার কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে হালাল চিহ্ন (সবুজ বৃত্ত) অথবা ই-কোড (খাবারে শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে কিনা তার নির্দেশক) দেখতে হবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

“আল্লাহ তাআলা তার গ্রন্থে যা বৈধ করেছেন তা-ই বৈধ এবং আল্লাহ তাআলা তার গ্রন্থে যা অবৈধ করেছেন তা-ই অবৈধ। আর তিনি যে সকল বিষয়ে নীরব থেকেছেন (বৈধ বা অবৈধ বিষয়ে কিছুই বলেননি) তা তার ক্ষমা ও উদারতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।“ [জামি’ তিরমিযী : ১৭২৬]

এছাড়া, অমুসলিমরা তাদের দেবতার নামে যে খাবার উৎসর্গ করে (মিষ্টান্ন, ফলমূল অথবা জবাইকৃত প্রাণীর গোশত), তা মুসলিমদের খাওয়া জায়িজ নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّ

“তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যাতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়।“ [সূরা বাকারা : ১৭৩]

অমুসলিম দেশে পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক-পরিচ্ছদে অমুসলিমদের অনুকরণ করা ইসলামে হারাম। মুসলিম হিসেবে নিজেদের আত্মমর্যাদা বোধের সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণ নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসার দাবি করে, সে কিছুতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রুদের অনুকরণ-অনুসরণ করতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

“আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।“ [সুরা হুদ : ১১৩]

হাদিস শরিফে এসেছে,

“যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, কিয়ামতের দিন সে ওই জাতির দলভুক্ত হবে। অর্থাৎ ওই দল জান্নাতবাসী হলে সে-ও জান্নাতবাসী হবে। আর ওই দল জাহান্নামবাসী হলে সে-ও জাহান্নামবাসী হবে।“ [সুনানু আবি দাউদ : ৪০৩১]

তাই যেসব পোশাক নির্দিষ্টভাবে বিধর্মীরাই পরিধান করে, সেগুলো পরিহার করা উচিত।

অমুসলিম দেশে নারীদের পর্দা

অমুসলিম দেশে যেভাবে নগ্নতার প্রসার ঘটছে, সেখানে নারীদের পর্দার সাথে চলাফেরা করা খুব কঠিন। সেসব দেশে পর্দা পালনে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। পর্দা ইসলামের একটি ফরয বিধান। তাই যে কোনো অবস্থাতেই নারীদের শরয়ী পর্দা মেনে চলা উচিত। মুসলিম নন-মাহরাম পুরুষের সামনে যেমন পর্দা পালন করা হয়, অমুসলিম পুরুষের সামনেও সেভাবেই পালন করতে হবে। অমুসলিম মহিলার সাথে মুসলিম নারীর পর্দা করা জরুরি নয়। তবে তার সামনে শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ করা এবং শরীরের আবৃত অংশ খোলা জায়িজ নয়।

হযরত উমর রা. বলেছেন, “যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে তার জন্য স্বজাতি ছাড়া অন্য কারো (বিধর্মী মহিলা) সম্মুখে শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশ করা জায়িজ নয়।“ [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/৪৫৫]

অমুসলিম দেশে বিয়ে

বর্তমানে অনেকেই অমুসলিম দেশে বসবাস করতে গিয়ে সেখানেই বিয়ে করে ফেলেন। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে, আহলে কিতাব (ইহুদি, খ্রিস্টান) ব্যতীত অন্যান্য অমুসলিম নর-নারীর সাথে মুসলিম নর-নারীর বিয়ে জায়িজ নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনের কয়েকটি আয়াতে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন :

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ

"আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে।" [সূরা বাকারা : ২২১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" [সূরা মুমতাহিনা : ১০]

এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো মুসলিম নর-নারীর জন্য অমুসলিম নর-নারীকে বিয়ে করা শরিয়তসম্মত নয়।

তবে শরিয়তে আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে। আল্লামা ড. ইউসুফ আল- কারযাভী আহলে কিতাব নারীদের সাথে বিয়ে জায়িজ প্রসঙ্গে বলেন,

"এটা এই বিষয়ের দলিল যে, অমুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা রাখা জায়িজ। স্ত্রী আহলে কিতাব হলে একজন পুরুষ কিভাবে তার স্ত্রীকে ভালো না বেসে থাকবে? মা যখন জিম্মি, তাহলে একজন লোক কিভাবে তার নানা-নানী, মামা-খালাকে ভালো না বেসে পারবে?"

কিন্তু ফকিহগণ এটাও বলেছেন যে, "আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ না করে মুসলিম নারীদের বিবাহ করাই উত্তম" [আহকামুল কুরআন, ২/১৮]।

অমুসলিম দেশে সন্তান প্রতিপালন

একজন মুসলিম যদি একটি অমুসলিম দেশে বাস করেন, তিনি চাইবেন তার সন্তান ইসলাম এর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠুক, ইসলাম সম্পর্কে জানুক, ইসলাম কে নিজের জীবন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে বেড়ে উঠুক। কিন্তু সন্তানকে যখন ইসলামিক জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয় তা তার জন্য অনুধাবন করা বেশ কষ্ট হয়। বেশির ভাগ সময় শিশু মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে না। মূল কারণ হিসাবে দায়ী হলো তার অনৈসলামিক পরিবেশে বেড়ে উঠা। শিশুটি ঘরে এক রকম শিক্ষা পাচ্ছে আর স্কুল,খেলার মাথা, বিনোদন কেন্দ্র, বাজার ইত্যাদি জায়গায় দেখছে সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। অন্য ভাবে বলা যায় , ইসলাম তাকে যে সব জিনিস না করতে বলছে – সে দেখছে তার বন্ধু বান্ধব অনায়াসে সে জিনিস করছে। এ দ্বিমুখী পরিবেশ শিশুদের মনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। সে হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব স্বকীয়তা। কোন সংস্কৃতি নিয়ে থাকবে সেই দ্বৈরথ এ থাকে সব সময় । ঠিক এ সময় এ বাবা মায়ের প্রয়োজন খুব বেশি। বাবা মা একটি শিশুর জন্য প্রথম আদর্শ। শিশুরা কখনোই একা একা সব শিখে যাবেনা। শিশু যখন ঘরের মধ্যে কোনো আদর্শ কে অনুসরণ করার জন্য পাবে না সে তাকাবে ঘরের বাইরে। একটি অমুসলিম দেশে ইসলামিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হবার জন্য যথেষ্ট উপকরণ ঘরের বাইরে ছড়িয়ে রেখেছে (ফ্রি মিক্সিং, নগ্নতা, নেশাদ্রব্য, হারাম পানীয়, পার্টি ইত্যাদি)। হারাম্থ্য পরিবেশ এবং পিতা মাতার যথেষ্ট পরিচর্চার অভাব এ শিশুর আদর্শিক অবক্ষয় অমুসলিম দেশের মুসলিম ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। তাই অমুসলিম দেশে মুসলিম পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ঘরের ভেতরে ও বাইরে বেশ কিছু শর্ত পূর্ণ করা উচিত:

- পিতাদের কতর্ব্য সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে মসজিদে গিয়ে নামায পড়া। যদি নিকটে কোন মসজিদ না থাকে তাহলে তাদের নিয়ে একত্রে বাসায় জামাতে নামায আদায় করা।
- প্রতিদিন তাদের অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করানো ও তিলাওয়াত শ্রবণ করা।

- তাদের উচিত পারিবারিক ও সামাজিক আদবগুলো মেনে চলা; কুরআন শরিফে আল্লাহ তাআলা যে আদবগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো মেনে চলা। যেমন- সূরা নূরে এমন কিছু আদবের উল্লেখ রয়েছে।
- শিশুদেরকে শিশুশ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যথাসম্ভব ইসলামিক স্কুলে পাঠানো উচিত।
- সন্তানদেরকে দূরবর্তী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না পড়ানো; যাতে করে তারা সেই ক্যাম্পাসে থাকতে বাধ্য হয়। তা না হলে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে হারাব এবং অচিরেই তারা কাফির সমাজে হারিয়ে যাবে।
- হালাল খাবার গ্রহণের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। পিতামাতা কোন ধরণের হারাম জিনিস গ্রহণ করবেন না; যেমন সিগারেট, মদ ইত্যাদি যেগুলো পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে সয়লাব হয়ে আছে।
- শিক্ষামূলক ক্যাম্পিং করা; যেগুলোতে গোটা পরিবারের সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারবে।
- পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে পবিত্র ভূমিতে হজ্জ্ব ও উমরাহ আদায় করতে ভ্রমণ করা।
- সাধারণ ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে সন্তানদেরকে অভ্যস্ত করে তোলা; যে ভাষা বড় ছোট, মুসলিম-অমুসলিম সবাই বুঝতে পারবে।
- নাচ-গানের অনুষ্ঠান, পাপে ভরপুর বিভিন্ন মেলা, অমুসলিমদের উৎসব ইত্যাদিতে না যাওয়া এবং খ্রিস্টান স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে রবিবারে গির্জায় যেতে খুব কৌশলে নিষেধ করা।
- ছেলেদেরকে অবিলম্বে বিয়ে করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা; যাতে করে তারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষা করতে পারে।

অমুসলিমদের দেশে চাকরি

অমুসলিম দেশে চাকরির ক্ষেত্রে কোনো না কোনো অমুসলিম ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে :

১. চাকরির প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি উভয়টি শরিয়ত মোতাবেক চালিত হতে হবে। শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজে নিযুক্ত হওয়া জায়িজ নেই। যেমন – অশ্লীলতা ও নগ্নতার প্রসার ঘটে এমন চাকরি।

২. ইসলাম ও মুসলিম জাতির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারবে না।
৩. চাকুরির কারণে যদি অন্তরে কুফর ও কাফিরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তবে সেই চাকরি করা জায়িজ নয়।

অমুসলিম দেশের উৎসবে অংশগ্রহণ

পৃথিবীতে প্রতিটি জাতি ও ধর্মের নিজস্ব উৎসব ও সংস্কৃতি রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সেসব উৎসব পালন করা হয়। যেমন – হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, হোলি, দিওয়ালি, খ্রিস্টানদের ক্রিসমাস, এছাড়াও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে থার্টি ফার্স্ট নাইট, হ্যালোউইন (শয়তানের উপাসনা) প্রভৃতি। অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বর্তমানে মুসলিমদের মাঝে একটি মহামারির আকার ধারণ করেছে। মুসলিমরা এসব উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো, উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এক শ্রেণির মানুষদের বলতে শোনা যায়, “ধর্ম যার যার, উৎসব সবার”, যা একটি অমানবিক ও অযৌক্তিক কথা। ধর্মীয় বিশ্বাস যে উৎসবের সাথে জড়িত সেই উৎসবকে সকলের জন্য সাধারণ করতে চাওয়া একটি হঠকারিতা।
কোনো মুসলিম যদি অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানায়, তাদের করা শিরকের উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো হয়। আর শিরক হলো ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে বড় পাপকাজ। তাই অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় ও তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে তাদের বাতিল ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করা হয়, যা হারাম।
আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।“ [সূরা আল ইমরান : ৮৫]
রাসূল (সাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে” (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)। তিনি বলেন, “যে আমাদের ব্যতীত অন্যদের রীতি- নীতির অনুসরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়” (তিরমিযী হা/২৬৯৫, মিশকাত হা/৪৬৪৯)। তিনি আরো বলেন, “শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে” (ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২, আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)।

খলিফা উমর (রা.) বলেছেন, "তোমরা মুশরিকদের উৎসবে তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করা থেকে বিরত থেকো" [আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ১৮৮৬১]।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, "যে ব্যক্তি কাফিরদের ভূখণ্ডে বসবাস করবে, তাদের ধর্মীয় উৎসব নওরোজ ও মিহিরজান পালন করে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে এবং ওই অবস্থায় মারা যাবে, সে কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গেই উঠবে" [আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ১৮৮৬৩]।

আল্লামা ইবনুল কাসিম থেকে বর্ণিত, যে নৌকা অমুসলিমদের ধর্মীয় মেলায় যাচ্ছে, তাতে আরোহণ করা মাকরুহ। কারণ, তাদের সাথে মিলিত হওয়াতে আল্লাহর অসন্তুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উসাইমীন (রহঃ) বলেন, "কাফেরদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে উপহার বিনিময়, মিষ্টান্ন বিতরণ, রকমারি খাদ্য তৈরী করা, কাজ বন্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম" (মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৬)।

সুতরাং, প্রত্যেক মুসলিমের এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা অপরিহার্য।

অমুসলিমদের সাথে আচরণ

অমুসলিম দেশে জীবনযাপন করতে গিয়ে মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদের। চলাফেরা, ওঠাবসা, লেনদেন, সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে একজন মুসলিম ও একজন অমুসলিমের সাক্ষাৎ হতে পারে। কোনো অমুসলিমপ্রধান দেশে মুসলিমদের বসবাস এখন বিচিত্র কিছু নয়। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। কোনো অমুসলিম যদি পুরনো ধর্ম ছেড়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তাহলে তো আরও অনেক অমুসলিমের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও থাকবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যেভাবে দলে দলে অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আসছে, তাতে এ বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক।

ইসলামে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধানও দেয়া হয়েছে- এ কথা ঠিক, তবে এও অনস্বীকার্য যে, যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের নিরাপত্তাদান, তাদের সাথে সৌজন্য বজায় রেখে উত্তম আচরণের কথাও বলা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের মাঠেও যেন অমানবিক আচরণ করা না হয়, যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরকে, বিশেষত নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর যেন হামলা করা না হয়- এ আদেশও দেয়া হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) তাঁর আশেপাশের অমুসলিমদের সাথে এমন হৃদ্যতাপূর্ণ সদাচরণ করতেন যা কোনো মানুষ নিজ পরিবারের একান্ত আপন লোকদের সাথে করে থাকে। এরকম বিভিন্ন ঘটনা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

হাদিস-১

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, “এক ইয়াহূদী ছেলে ছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করত। একবার সে অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য আসলেন। অতঃপর তার মাথার কাছে বসে বললেন, “তুমি ইসলাম গ্রহণ কর”, তখন ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকালে তার পিতা বললো: তুমি আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা মেনে নাও। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন”। [সহীহ বুখারী : ১২৯০]

হাদীস-২

সাহাবী হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, "একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাঁকে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো এক ইহুদির লাশ!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে"। [সহীহ বুখারী : **১৩১১**]

হাদীস-৩

হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও হযরত কায়েস ইবনে সাদ রা. একদিন বসা ছিলেন। তারা তখন কাদিসিয়ায় থাকেন। পাশ দিয়ে একটি লাশ নেয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা দুজনই দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে জানাল, "এ এক অমুসলিমের লাশ"। তাঁরা তখন শোনালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়েও একবার এক লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি যখন তা দেখে দাঁড়ালেন, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أليست نفسا অর্থাৎ "সে মানুষ ছিল তো?" [সহীহ বুখারী : **১৩১২**]

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরোক্ত হাদীসগুলোই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

যদি কারও কোনো প্রতিবেশী অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হল- তার সাথেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের হক রক্ষা করে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্ক রক্ষা করার ওপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে।

সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, একজন প্রতিবেশীর ওপর আরেকজন প্রতিবেশীর কী হক রয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, 'যদি সে তোমার কাছে ঋণ চায় তাহলে ঋণ দেবে, যদি তোমার সহযোগিতা চায় তাহলে তাকে সহযোগিতা করবে, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার খোঁজখবর নেবে, তার কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে তাকে তা দেবে, সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার খোঁজখবর নেবে, যখন সে ভালো কিছু লাভ করবে তখন তাকে শুভেচ্ছা জানাবে, যদি সে বিপদে পড়ে তাহলে সান্ত্বনা দেবে, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হবে, তার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘর এত উঁচু করবে না যে তার ঘরে বাতাস ঢুকতে পারে না, কোনো ভালো খাবার

রান্না করলে তাকে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে কষ্ট দেবে না, তবে যদি তার ঘরেও সে খাবার থেকে কিছু পৌঁছে দাও। যখন কোনো ফল কিনে তোমার বাড়িতে নেবে তখন হাদিয়াস্বরূপ তাকে সেখান থেকে কিছু দেবে। [খারায়েতী, তবারানী, আবুশ শায়খ- ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৫১৯; কিতাবুল আদব, বাব-৩১]

অমুসলিমদের সাথে সুন্দর ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ রক্ষার শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি ইসলাম তাকিদের সাথে বারবার এ নির্দেশও দিয়েছে- 'কোনো মুসলমান যেন কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।' এবং এ তাকিদও করেছে, সৌজন্য ও উদারতার নামে যেন নিজেদের দ্বীনদারি আক্রান্ত না হয়। দ্বীনের বিষয়ে আপোস করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। এমনিভাবে সদাচরণের ক্ষেত্রে কোনো অমুসলিমকে মুসলিম ভাই থেকে প্রাধান্য দেওয়াও বৈধ নয়।

অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সূরা মুমতাহিনার এই নির্দেশনাটি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য :

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম।“ [সূরা মুমতাহিনা : ৮-৯]

শরীয়তের সীমারেখায় থেকে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে যেমন অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তেমনি এ আচরণটুকুও অনেক সময় দাওয়াতের ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন মহানুভব আচরণে মুগ্ধ হয়েও তো অনেকেই ইসলাম কবুল করেছেন এবং পরবর্তীতেও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যারাই ইসলামের সুন্দর আচারগুলো নিজেদের মাঝে লালন করে গেছেন, তাদের আচরণই নীরবে অমুসলমানদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছে। অনেক অমুসলিম এতে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে এবং আশ্রয় নিয়েছে ইসলামের শীতল ছায়ায়।

উপসংহার

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের ক্ষেত্রে যেমন ইসলামি শরিয়তে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা আছে, তেমনি বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনও আছে। তবে সেই প্রয়োজন কখনোই মুসলিমের প্রাচুর্যময় জীবনযাপনের জন্য নয়। এই প্রয়োজন পুরো বিশ্বের মানুষের। একমাত্র মুসলিমরাই পারেন রাসূল (সাঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতির জন্য কল্যাণকর কাজে শামিল হতে। একজন মুসলিমের মনে স্বদেশের প্রতি যেমন ভালোবাসা থাকবে, তেমনি অমুসলিম জাতির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য কাজ করার মনোভাব থাকতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, অমুসলিমরা কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, বরং তারা মুসলিমদের জীবনযাপন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই অমুসলিম দেশে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলিমের উচিত জীবনের যে কোনো অবস্থাতে ইসলামি শরিয়ত মেনে চলা এবং মনোমুগ্ধকর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতির প্রতিনিধি হিসেবে বসবাস করা।

গ্রন্থপঞ্জি

- অমুসলিম দেশে মুসলমান : মুফতি আখতার ইমাম আদিল কাসিমি
- অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত : মিসবাহ উদ্দিন ও মোঃ ইসহাক
- অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক : মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
- অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব : আ.জ.ম. শামসুল আলম
- অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসূল (সাঃ) : ড. রাগিব সারজানি
- ইসলামে হালাল-হারামের বিধান : আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী
- কাশগড় কতো-না অশ্রুজল : মুহাম্মাদ এনামুল হোসাইন
- বাংলায় বাজে গির্জার বাঁশি : ওমর আলী আশরাফ
- বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন : গাজী শামছুর রহমান
- মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক : মুফতি উবাইদুর রহমান
- https://alkawsar.com/
- https://at-tahreek.com/
- https://ifatwa.info/
- https://islamqa.info/
- https://muslimbangla.com/
- https://www.quraanshareef.org/
- https://bn.wikipedia.org/